

একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস ॥

সন ১২৪০ সাল। সকাল বেলা। কাল দোলপূর্ণিমা।

কালীপদ চৌধুরী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। খই-দই খাইয়া তিনি এখনই রওনা হইবেন। অক্ষয় মিস্ত্রিকে ডাকিয়া আনিয়া কোঠাঘরের আনুমানিক ব্যয় ঠিক করিতে হইবে।

রামতারণ বাঁড়ুয়ে কৃষ্ণনগর কোটের নকলনবিশ (গ্রামে অগাধ পয়সা প্রতিপত্তি) দু পয়সা করিয়াছেন, গোলাপালা, জমিজমাও করিয়াছেন। ছুটিতে রামচরণ বাড়ী আসিয়াছেন, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক টানিতেছেন সকালবেলা। কালীপদ চৌধুরীকে দেখিয়া কহিলেন—কোথায় চললে হে?

—আজ্ঞে কাকা, অক্ষয় মিস্ত্রীকে একবার ডাকতে যাচ্ছি।

—কেন হে? অক্ষয় মিস্ত্রীকে কি হবে তোমার?

কালীপদ আসিয়া বসিলেন চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। বলিলেন—বাঃ, এবার মিছরে গাছটাতে খুব বোল হয়েছে দেখছি।

বসন্তের সকাল। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, আম্রমুকুলের সুমিষ্ট সৌরভে ভরপুর।

রামতারণ বলিলেন, আর-বারও বোল হয়েছিল ভাল, কুয়াশাতে সব ঝাঁই পড়ে গেল। দেখ এ বছর কি হয়। বোল তো ভালই হয়, তবে টিকে থাকে না। বস বাবা।

এই সময় রামতারণের ভাইঝি একটা কাঁসার সাগুরিতে চাল-ভাজা, নারকেল-কোরা ও খানিকটা গুড় লইয়া আসিয়া বলিল—জেঠামশায়, খাবার খান।

রামতারণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ও শৈল, এই তোর কালীপদ-দাদা এসেছে। বাড়ী গিয়ে তোর জেঠাইমাকে বল গে—

কালীপদ বলিলেন,—না না, কাকা। আমি এই মাতুর খই-দই খেয়ে বেরিয়েছি। আমায় যেতে হবে সেই পুবপাড়া। অক্ষয় মিস্ত্রীকে বাড়ী পাওয়া দরকার। আমি উঠি।

—না না, বস, দুটি চালভাজা খেলে তোমাদের মতন ছেলে-ছোকরা মানুষের আর অক্ষিধে হবে না। যা শৈলি, নিয়ে আয় তো। ভাল হয়ে উঠে এসে বস না। তুমি আজকাল সেই জমিদারি সেরেস্তাতেই কাজ করছো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু পরে শৈলি আর এক বাটি চালভাজা ও গুড় লইয়া আসিয়া কালীপদর সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামেও অবিবাহিত কিশোরী মেয়ে গ্রামের তরুণ যুবক প্রতিবেশীর সহিত গুরুজনের সম্মুখে কথাবার্তা বলিতে পারিত না।

শৈলি মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী, দেখিতে শুনিতে ভাল। রংও ফর্সা। চাহিয়া দেখিবার ও দু-একটি কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও কালীপদ সামলাইয়া গেলেন।

রামতারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তারপর, অক্ষয় মিস্ত্রির কাছে কী মনে করে?

—দুটো পাকা ঘর করব ভাবছি, কাকা।

রামতারণ একটু বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। সেদিনের ছেলে কালীপদ, ওর বাবা পয়সা রাখিয়া যায় নাই মৃত্যুকালে। একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ও বিধবা মা লইয়া ওর সংসার। আজ আট-দশ বৎসর কি করিয়া চলাইতেছে, রামতারণ বাঁড়ুয়ে তাহার খবর রাখা আবশ্যিক মনে করেন নাই। কিন্তু সেই কালীপদ আজ তাহার পৈতৃক আমলের চৌচালা খড়ের ঘর ছাড়িয়া পাকা বাড়ীতে বাস করিবার স্পর্শ করিতেছে। এত পয়সা ছোঁড়ার হাতে আসিল কিভাবে?

রামতারণ বলিলেন—হঁ।

—আচ্ছা কাকা, আপনি বলতে পারেন, দুখানা ঘর মাত্র, দরজা জানালা, সামনে একটু রোয়াক—এতে কত খরচ পড়তে পারে? তাই যাচ্ছিলাম অক্ষয় মিস্ত্রির কাছে। আপনার আঁচ পেলে আর অতদূরে যাই নে।

—হঁ।

—তাহলে যদি বলেন—

—দাঁড়াও। কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হচ্ছে। আনি।

কাগজ কলম আনিয়া হিসাবপত্র জুড়িয়া দেখা গেল আটশ টাকার কমে ও রকম একখানি ছোট বাড়ী তৈয়ারি হয় না, সব জিনিসের দাম বেশি। ইটের হাজার সাতটাকা। সাড়ে দশ আনা সিমেন্টের বস্তা। রাজমিস্ত্রির মজুরি দশ আনা, পেটেল মজুরের চার আনা হইতে স' পাঁচ আনা। রামতারণ ভাবিয়াছিলেন, খরচের হিসাব পাইলে ছোঁড়ার চুলবুলুনি ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু দেখা গেল, তাহা নয়, ছোঁড়া দমিল না। বরং বলিল—আট শ টাকা তো? না হয় শ'খানেক টাকা এদিক-ওদিক হতে পারে, কি বলেন? তাহলে পঁজি দেখে একটা শুভদিন দেখে নিন, কাকা। সূত্র ফেলা যাক।

রামতারণ বলিলেন—তা একদিন দেখো এখন। কোঠা করছ—বড় আনন্দের কথা। তোমাদের উন্নতি দেখলে মনে বড়ই আনন্দ হয় বাবা। আহা, আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন। তা সবই ভাগ্য।

কালীপদ রামতারণ বাঁদুয্যের পদধূলি লইয়া বলিলেন—আপনি আশীর্বাদ করুন কাকা, যেন মাকে অন্তত কোঠাঘরে শোয়াতে পারি। আপনাদের আশীর্বাদ—

—হবে, হবে বাবা, হবে বই কি। তবে হাজার টাকা টাঁকে টাঁকে গুঁজে তারপর কাজে হাত দিও। দেখো, যেন অর্ধেক হয়ে পড়ে না থাকে। বড় শক্ত কাজ। ছেলেমানুষ কিনা, তাই বলছি।

—আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে সব করব। আমার আর কে আছে আপনাদের পাঁচজন ছাড়া। কত কষ্টে মানুষ হয়েছি বাবা মারা যাওয়ার পরে, সবই তো জানেন। কোনদিন খাওয়া জুটেছে, কোনদিন জোটে নি। ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে মায়ে পোয়ে পরেছি। দুধ-ঘি এর মুখ দেখেনি কোনদিন।

—হ্যাঁ হে, তোমার ভগ্নীটি তো প্রায় এগার বছরে পড়ল। আর তো ঘরে রাখা যায় না, এবার ওর একটা বিয়ের জোগাড় কর। পল্লীগ্রাম জায়গা, লোকে কি বলবে না বলবে। বাড়ী না হয় দু বছর পরে করো—ভগ্নীর বিবাহটি আগে দাও।

—তাও সন্ধান দেখছি কাকা। ওবেলা এসে বলব এখন সব। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

কালীপদ চৌধুরী চলিয়া গেলেন। রামতারণ বাঁদুয্যের সকালটা মাটি হইয়া গেল। নাঃ, আজ আর কোন কাজ করা চলিবে না। কি কুক্ষণে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে তামাক খাইতে বসিয়াছিলেন।

রামতারণ বাঁদুয্যে অন্যভাবেও দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, একবার মিস্ত্রীদের কাজ করা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর একবার অন্য কি একটা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপদ চৌধুরীর কোঠাবাড়ী তাহাতে বন্ধ থাকে নাই। অবশেষে যেদিন সুন্দর দুইকুঠুরি পাকা ঘর নির্মাণ শেষ করিয়া কালীপদ চৌধুরী গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিলেন, বাস্তুপূজা ও সত্যনারায়ণের সিন্ধির আয়োজন করিলেন, রামতারণ সেদিন তাঁহার কৰ্মস্থল গোয়াড়িতে। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ী। কালীপদ চৌধুরীর মা সেই রাত্রিতে এ ঘরে প্রথম শুইলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি। বর্ষাকাল। মনে পড়িল, এই বর্ষার দিনে খড়ের ঘরে জল পড়িত মটকা দিয়া, গরীব স্বামীর কখনও সে দুঃখ ঘুচাইতে পারেন নাই। আজ উপযুক্ত ছেলে সে খড়ের চালার জায়গায় পাকা ঘর তুলিল। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।

জগদম্বা দেবী সে রাত্রে আদৌ ঘুমাইতে পারিলেন না। দোর-জানলায় নূতন রং মাখানো হইয়াছে—তাহার গন্ধটা বড় উৎকট। এক-একবার সে গন্ধটা মনে পরম আনন্দ বহন করিয়া আনে, চোখ বুজিয়া থাকিতে থাকিতে মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া ঘরের চারিধারে চাহিয়া দেখেন। না, পাকা ঘরই বটে। ওই তো কড়িকাঠ, ওই তো পাকা চুনকাম করা দেওয়াল—ওই সেই রঙের উৎকট গন্ধটা। স্বপ্ন নয়—সত্যই কোঠাঘরে শুইয়া আছেন বটে।

এই দিনটি হইতে কালীপদ চৌধুরী গ্রামের মধ্যে মাতব্বর হইয়া উঠিলেন। রামতারণের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি হইতে চাহেন নাই, কিন্তু গ্রামের লোক সালিশ মীমাংসা ইত্যাদি কার্যে তাঁহার সাহায্য চাহিতে লাগিল, বারোয়ারির

চাঁদা আদায়ের ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা আরও ভাল হইয়া উঠিল, তিনি কাছরির নায়েবি পদ পাকাপোক্তভাবে বহাল হইয়া সুখ্যাতির সহিত উক্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মাহিনা কুড়ি টাকা বটে, কিন্তু রোজগার করিতেন ষাট-সত্তর টাকা। যে সময় ন সিকা উৎকৃষ্ট বালাম চাউলের মণ, দশ আনা গব্য ঘৃতের সের, ষোল সের খাঁটি দুগ্ধ টাকায়, একটা দু-তিন সের ওজনের রোহিত মৎস্যের দাম বড়জোর এক টাকা—সে সময়ে কালীপদ চৌধুরী গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন মাতব্বর গৃহস্থ বলিয়া গণ্য কেন না হইবেন।

বেলপুকুরের মহিমাচরণ গাঙ্গুলির কনিষ্ঠা কন্যা হৈমবতীর সঙ্গে কালীপদ চৌধুরীর শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হইল। লক্ষ্মী যখন আসেন, কোন দিক দিয়া আসেন বোঝা যায় না। এই বিবাহের পর হইতেই কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা খুব ভাল হইতে লাগিল। রামতারণ বাঁড়ুয়ে বৃদ্ধ হইয়া কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলেন; নকলনবিশের কাজে পেনশন নাই, তাঁহার অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়া পড়িল। তবে একেবারে গরীব হইয়া তিনি কোনদিনই পড়েন নাই, কারণ হুঁশিয়ারি রামতারণ অনেক জায়গাজমি করিয়া লইয়াছিলেন। বছরের ধান গোলায় মজুত থাকিত।

কালীপদ চৌধুরীর একটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। ছেলেটি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িবার পরে কিছুদিন বাড়ী বসিয়া জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য শিখিতেছিল, কিন্তু এক বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে দূরবর্তী মহকুমার ইংরেজীস্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। ইংরেজী লেখাপড়ার চাল তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। দু-তিনটি ছেলে এণ্ট্রান্স পাশও করিয়াছেন, রামতারণ বাঁড়ুয়ের বড় নাতি তাহাদের অন্যতম।

১২৮০ সাল।

কালীপদ চৌধুরীর ছেলে সুকুমার চৌধুরী দেশেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করিয়া দুপয়সা উপার্জন করিতেছে। কালীপদ চৌধুরীর বয়স চৌষড়ির কোঠায় ঠেকিয়াছে, রামতারণ বাঁড়ুয়ে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছেন তবে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার আর ক্ষমতা নাই। তাঁহার ছেলেরা চাকুরি করিতেছে।

আবার বাড়ী হইবে।

সুকুমারের সময় নাই, সে পসারওয়ালা ডাক্তার, বৃদ্ধ কালীপদ চৌধুরী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় চুন, কোথায় সিমেন্ট। দুটি বড় সেগুন গাছ কাটাইয়াছেন, সর্ব পরামাণিকের বাগানে। মুর্শিদাবাদ হইতে করাচী টানিবার মিস্ত্রি ও ছুতার মিস্ত্রি আনাইয়া সেই বাগানেরই কাঠচেরাই ও দরজাজানালা কড়িবরগা ইত্যাদি তৈরি হইতেছে। ছেলে বাড়ী দোতলা করিবে, পূজার দালান তৈরি করিবে, পুকুর কাটাইবে,—বৃদ্ধের উৎসাহের সীমা নাই। অতিবৃদ্ধ রামতারণ (৮৯) বলিলেন—কে?

–এই কাকা, আমি কালীপদ।

–এস এস বাবা, কি মনে করে?

–শুনলাম আপনি নাকি কথানা পুরনো কড়ি বিক্রি করবেন?

–কার বাড়ী?

–আজ্ঞে বাড়ী না, কড়ি। ঘরের কড়ি। বিক্রি আছে শুনলাম আপনার এখানে?

–কেন?

–সুকুমার বাড়ীটা দোতলা করবে–আর বলছে পূজোর দালানটা করবে সঙ্গে সঙ্গে। মহামায়ার কৃপা সবই। যদি তাঁকে এবার আনা যায়। আর আমার তো এখন গেলেই হয়–আপনাদের কোলে–পিঠে মানুষ হলাম, আমরাই বুড়ো হয়ে গেলাম। এখন ওদের সব–নাতি দুটো আছে, ধূলো গুঁড়ো বংশের। আশীর্বাদ করুন যেন ওরা মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখে।

–বস, বস বাবা। সুকুমার হীরের টুকরো ছেলে, তা বাড়ী করবে বই কি। দুপয়সা রোজগারও করছে। আর আমার ওই বাঁদরগুলো দেখ। মানুষ হল না। পুরনো কড়ি আছে, নিয়ে যেও। ও আমার সেই পৈতৃক আমলের বাড়ীর কড়ি। নিয়ে যেও, দর একটা যা হয় ঠিক করে দেব।

কালীপদ বিদায় লইলে রামতারণ বাঁড়ুয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

খাইতে পাইত না ওই কালীপদ চৌধুরী, ওর মা লোকের বাড়ী রাঁধুনির কাজ করিয়া ছেলেকে মানুষ করিয়াছিল, তিনি তো সবই জানেন। আজ তাহার ছেলে দোতলা কোঠা তুলিতেছে। আবার পূজার দালান তুলিয়া দুর্গোৎসব করিবে বলিয়াও শাসাইয়া গেল। সবই অদৃষ্ট।

তিন মাসের মধ্যে সুকুমারদের দোতলা বাড়ী উঠিল বিস্তর ছুটাছুটির পরে। একখানা মনের মত বাড়ী তুলিতে সোজা হাঙ্গামা নয়, চুন সুরকি ইট কাঠ জোগাড় করিতে এই তিন মাস পিতাপুত্রের সময়ে স্নান হয় নাই, সময়ে আহার হয় নাই। খুব ধূমধামে গৃহপ্রবেশ হইল, রামতারণ বাঁড়ুয়ে চিড়ে দই–এর ফলার করিয়া গেলেন। আবার সেই আশ্বিন মাসে সুকুমারদের বাড়ীর প্রথমে দুর্গোৎসবে খিচুড়ি মাংস খাইলেন, কবির গান শুনিলেন।

পর পর এত আঘাত বোধ হয় অতিবৃদ্ধ রামতারণের সহ্য হইল না। সেই অগ্রহায়ণ শীতকালের প্রথমেই সামান্য দুদিনের জ্বরে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।

সুকুমার পৈতৃক ভিটাতেই দোতলা বাড়ী উঠাইয়াছিল। তাহার পিতা প্রথম যৌবনে সর্বপ্রথম যে একতলা ক্ষুদ্র বাড়ীটা তোলেন ভিটাতে, যে বাড়ীটা এক সময় রামতারণ বাঁড়ুয়ের মনে কত ঈর্ষার সঞ্চারণ করিয়াছিল, সে বাড়ীটার আদর কমিয়া গেল। দোতলা বাড়ীর পিছনে সেটা অনাদৃত অবস্থায় জিনিসপত্র রাখিবার ভাঁড়ার ঘর

এবং দু-একজন আশ্রিতা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়াদের শয়নঘর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হ্যাঁ, কেবল একটি কথা। বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা ও সিন্ধি বিতরণ করা হইলে তাহা ওই পুরানো কোঠাবাড়ীতেই হইয়া থাকে।

সুকুমার ডাক্তার হিসাবে নাম করিল ভাল। অনেক দূর হইতে লোকে রোগী দেখাইতে আসে। যাহারা আসে, তাহারা একবার ডাক্তারবাবুর নতুন দোতলা বাড়ী দেখিয়া যায়। পূজার দালান তো গ্রামে মোটে ওই একটি। দুর্গোৎসবও ডাক্তারবাড়ী ছাড়া আর কোথাও হয় না।

সুকুমারের দুই সংসার। প্রথম পক্ষের কোন সন্তানাদি হয় নাই, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর পর পর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে হইল। লোকে যে অনেক সময় গল্প করে, নিঃসন্তান প্রথমা স্ত্রী স্বামীর বংশ রক্ষার জন্যে নিজেই স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করে, সুকুমারের জীবনে তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে।

সুকুমারের প্রথমা স্ত্রী তরুণালা পরমা সুন্দরী। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া কালীপদ চৌধুরী পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহের পর দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সন্তানসন্ততি বংশে একটিও আসিল না।

সুন্দরী তরুণালার রূপ ফাঠিয়া পড়িতেছে। খিড়কিতেই কালীপদ শখ করিয়া পুকুর কাটিয়া ঘাট বাঁধাইয়াছিলেন, পুকুরঘাটে যখন বড় বৌ নাহিতে নামে, ঘাট আলো করে রূপে।

সেদিন রাত্রে তরুণালা স্বামীকে বলিল—একটা কথা রাখতে হবে।

—কি কথা?

—বল রাখবে?

—না শুনে কি করে বলি?

—তোমার আবার বিয়ে দেব।

—হ্যাঁ, একটা কথার কথা বটে। একটা কেন, দুটো দাও।

—ও চালাকি রাখ। মেয়ে দেখে রেখেছি। ছেলেপুলে না হলে বংশ থাকবে কি করে? পয়সাকড়ি রোজগার করছ কার জন্যে?

—কথাটা সত্যিই ভেবে দেখি নি। না, বিয়ে করা দরকার হয়ে পড়েছে দেখছি।

—তুমি যতই চালাকি কর, আমি কিন্তু জানি বাবার মন খুব খারাপ। বংশে বাতি দিতে কেউ না থাকলে তাঁর মন খারাপ হবারই কথা।

—এসব তোমার মনের কথা?

–নিশ্চয়ই। তুমি কি ভাব আমি ঠাট্টা করছি?

–সুকুমার সেবার কথাটা যতই ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিক, অবশেষে পুনর্বার বিবাহ তাহাকে করিতেই হইল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম নীরজাসুন্দরী, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়। বেশ স্বাস্থ্যবতী ও শান্তসম্ভাব। বিবাহের তিন বৎসর পরে একটি কন্যা ও আরও দুই বৎসর পরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া ডাক্তারবাড়ী আলো করিল।

তরুবালা সর্বদাই দোতলার ঘরে ছেলোট লইয়া বসিয়া থাকে।

কেহ আসিলে গর্ভের সঙ্গে বলে—এই দেখ পিসি, আমার ছেলে।

একবার একটি মছুরা জুটিয়াছিল। সে বুড়ি পাশের বাড়ীর শ্যামাপদ বাঁড়ুয়ের মা। বড়লোকের বৌ তরুবালা খোসামোদ করিয়া কখনও দুধ, কখনও পাটালি, কখনও একখানা নতুন কাপড়, কখনও বা এক কাঠা সোনামুগের ডাল হাতড়াইয়া যাইত। সেদিন তরুবালা অমন বলিতেই বুড়ি বলিল—আহা, বড় বৌমার যা কাণ্ড।

তরুবালা বলিল—কেন খুড়িমা?

–সতীন-পোর দেখা পেয়েছ, নিজের ছেলের সোয়াদ তো পেলো মা—আহা না। দুধের সোয়াদ কি ঘোলে মেটে?

–কেন?

–আহা মা, তোমার মুখের দিকে চাইলে কষ্ট হয়? কথা বলে সতীন কাঁটা। তার খোকা। তোমার তাতে কি? বড় হয়ে কি ও তোমায় ভাল চোখে দেখবে?

এইদিন হইতে তরুবালা তাহাকে এড়াইয়া চলিত।

ক্রমে নীরজাসুন্দরী আরও তিনটি পুত্রসন্তানের জননী হইল।

কনিষ্ঠ পুত্রটি লেখাপড়ায় ভাল হইয়া উঠিল, সব পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, সব বিষয়ে সমান জানে-শোনে। গ্রামের মধ্যে অমন ছেলে দেখা যায় নাই ইতিপূর্বে বৃদ্ধ কালীপদ তো নাতিকে পলকে হারায় এমনি অবস্থা। নাতির কথা সকলকে গর্ব করিয়া বলিয়া না বেড়াইলে তাঁর দিন কাটে না।

যে বৎসর ছেলোট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল, সুকুমারের প্রথমা পত্নী তরুবালা সেবার বৈশাখ মাসে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া সৎছেলে-মেয়েগুলিকে কাঁদাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিল।

তরুবালা মৃত্যুতে গ্রামের এমন লোক ছিল না যে চোখের জল ফেলে নাই। ১৩১০ সালের বৈশাখ মাস সেটা।

তার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। অনেক সুখদুঃখের ঝড় বহিয়া গেল সংসারের উপর দিয়া।

সুকুমারের ছেলে অনাথবন্ধু ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে ভাল চাকরি পাইয়া দিল্লি চলিয়া গেল। অন্য দুটি ছেলের মধ্যে একটি উকিল ও অন্যটি ডাক্তার হইয়া কলিকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করিয়া দিল, কারণ দেশে নিজের বাবা

পসারওয়ালা ডাক্তার, ডাক্তারি শিখিয়া ছেলে সেখানে বসিলে কোন লাভ নেই। সুকুমারও ভাবিল, অনেক দিন হইতেই কলিকাতায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করিবার যে শখটা ছিল, নিজের ছেলের মধ্য দিয়া সেটা সার্থক করিয়া তোলা যাক।

কালীপদ চৌধুরী এখন অতি বৃদ্ধ। বিশেষ নড়িতে চড়িতে পারেন না। নাতবৌয়েরা সেবা করিলে খুব ভাল লাগিত বৃদ্ধের, কিন্তু একাল পড়িয়া গিয়াছে—নাতবৌয়েরা স্বামীদের সঙ্গে বাসায় বাসায় ঘোরে।

যদি কোন নাতবৌ কখনও আসে গ্রামের বাড়ীতে দু-এক সপ্তাহের জন্য, কালীপদ তাহাকে পাইয়া বসেন। যত গল্প তাহার সঙ্গে। সে বেচারীকে কাজ করিতে দিবেন না, তাহার নিজের ছেলেপুলেদের তদারক করিতে দিবেন না—কেবল বলিবেন, বস দিদি, বস। এই শোন, তোমার শ্বশুর যখন ছোট ছিল—

অর্থাৎ কেবল সুকুমারের গল্প।

বৃদ্ধ বললেন—বুঝলে দিদি, সুকুমার আমার বংশের চূড়ো—

তার পর বলেন, আগে এই ভিটাতে কি রকম খড়ের ঘর ছিল, তিনি হাতে সামান্য কিছু জমাইয়া পুরানো কোঠাঘরটি করেন। দুই কুঠুরি, ছোট বারান্দা। সে কি আনন্দ উৎসাহের দিনই গিয়াছে। চিরদিনের খড়ের ঘর ঘুচাইয়া প্রথম পাকা বাড়ী করার আনন্দ। গ্রামের লোকের চোখে প্রথম বড় হওয়া। অনেক লোকের প্রশংসা, অনেক লোকের ঈর্ষা অর্জন করা। জীবনে একটা কিছু করা হইল এই প্রথম। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ী।

—তোমার দিদিশাশুড়ি, বুঝলে, আজ যদি বেঁচে থাকত—

নাতবৌ ঠাট্টা করিয়া বলে—কোন্ পক্ষের কথা বলছেন দাদু? আপনাদের সময়ে তো নাকি—

—ও সে আবার কি? ও হ্যাঁ, তা এক পক্ষই ছিল, এখন এই আর এক পক্ষ হয়েছে এমন টুকটুকে—বলিয়া নাতবৌয়ের গাল টিপিয়া দেন।

—নাতবৌ বলে—ও দাদু, এবার চলুন আপনাকে বাসায় নিয়ে যাব।

—না দিদি। সে বয়েস আর কি আছে? এখন গাড়ীতে উঠতে নামতে ভয় হয়।

তার পর অনেক বছর কাটিয়া গেল।

১৩৪০ সাল।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর পৌত্র অনাথবন্ধু এখন ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে বড় চাকুরে। পেনসন লইবার সময় এখনও হয় নাই। তবে খুব বেশি দেরিও নাই। বড় ছেলেটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অন্য দুটি ছেলে এখনও ছাত্র। অনাথবন্ধুর পিতা সুকুমার এখন বৃদ্ধ। ছেলেরা এখন আর তাঁহাকে ডাক্তারি করিতে দেয় না।

লেক রোডের ধারে হাল-ফ্যাশনের তেতলা বাড়ী সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। দুই ছেলের নামে পাশেই কয়েক কাটা জমি আগেই অনাথবন্ধু কিনিয়া রাখিয়াছিলেন—আজ বছর দশেক আগে এক দালাল বন্ধুর সাহায্যে। গৃহপ্রবেশের দিন অনেক বড় বড় চাকুরে, এমন কি কয়েকজন সাহেবসুবো নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালই হইল।

অনাথবন্ধুর প্রতিজ্ঞা ছিল কলিকাতায় বাড়ী না করিয়া বড় ছেলের বিবাহ দিবেন না। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ কত বড় বড় ঘর হইতে আসিতেছিল। এইবার বাদুড়াগানের বিখ্যাত গাঙ্গুলি পরিবারের মেয়ের সহিত শুভদিনে পুত্রের বিবাহ দিয়া অনাথবন্ধু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বৃদ্ধ সুকুমার ডাক্তার এই উপলক্ষে দেশের বাড়ী হইতে সেই যে কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া যান নাই। ছেলেরা যাইতে দেয় নাই।

নববিবাহিত পৌত্র অরুণ বলিল—কেমন বাড়ী হয়েছে দাদু?

বৃদ্ধ সুকুমার বলিলেন—বেশ হয়েছে চমৎকার।

—আর তুমি কিন্তু দেশে ফিরো না, সেখানে মশা, ম্যালেরিয়া—

—তা বটে, তবে—

—তবেটা আবার কি শুনি দাদু? চল আমার সঙ্গে আমার সেখানে। শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে চমৎকার কোয়ার্টারস—

—বেশ বেশ। হ্যাঁ দাদু, হাকিমি করে এসে সন্ধ্যাবেলা এতদিন কি করতিস? আজ না হয় নাতবৌ হল—

—কেন, পাশেই টেনিস কোর্ট। জেলখানার পাশেই। সরকারী ডাক্তার, খুরশেদ আলি সেকেণ্ড অফিসার, সার্কল অফিসার দত্ত, জুট অফিসার আবদুল সোভান—সবাই টেনিস খেলি। তোমার নাতবৌয়ের অভাব অনুভূত হয় নি একদিনও। চল দাদু আমার সঙ্গে—

—দাদু, গাঁ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ওই গাঁয়ে বাবা যেদিন খড়ের বাড়ী ঘুচিয়ে প্রথম দুটি মাত্র পাকা কুঠুরি তুললেন, সেদিনের আনন্দ ওই ভিটের মাটির বুক লেখা আছে। বংশের প্রথম কোঠাঘর। কত কষ্টের কত আনন্দের জিনিস। ওই ভিটেতে আমার প্রথম স্ত্রী—তোমার বড় ঠাকুরমা—

এই সময়ে অরুণের ভাই তরুণ আসিয়া ডাকিল—দাদা—ওপরে যাও—টেলিফোনে কে ডাকছে।

১৩৫০ সাল।

স্বর্গত সুকুমার চৌধুরীর গ্রামের ভিটা বনেজঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে। দোতলা কোঠার দেওয়ালে বড় বড় ডুমুর ও অশ্বথ বৃক্ষ। লোকে বলে ডাক্তারের ভিটায় দিনমানে বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। গত আট বৎসর এ ভিটায় পুত্র ও নাতির কেউই আসে নাই। জানলা-দরজার অনেকগুলি লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর তৈরি প্রথম আমলের সেই একতলা বাড়ীর ছাদ কয়েক বৎসর বর্ষার জল খাইয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—জীর্ণ দেওয়াল দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। সাপের ভয়ে আজকাল ডাক্তারের ভিটার ত্রিসীমানা কেহ মাড়ায় না।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥